গাজা সঙ্কটঃ কেন এই আগ্রাসন?

মারওয়ান বিশারা

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলার প্রেক্ষিতে তীব্রতর হয়ে ওঠা ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দের নানা দিক ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন কাতারভিত্তিক প্রভাবশালী টিভি চ্যানেল আল জাজিরার সিনিয়র রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারওয়ান বিশারা।

কেন গাজায় এমন উত্তেজনা?

কোন যুদ্ধ বা সংঘাতের কারণ দুই ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে: স্বল্পমেয়াদী সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যাখ্যার সাহায্যে। গাজায় চলমান সংঘাতকেও আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবোঃ

> প্রথমত, সংঘাতের কারণ হিসাবে কিছু ঠুনকো বিষয় জনসম্মুখে প্রচার করা হচ্ছে কৌশলগত বিবেচনায় যেসবের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তেমন কিছু বহুল প্রচারিত খোঁড়া অজুহাত, যেমন: "আমরা আত্মরক্ষা করছি"; "আমরা আমদের নাগরিকদের রক্ষা করছি"; "তারাই এটা প্রথম শুরু করেছে"; "কোন রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের উপর এমন রকেট নিক্ষেপ মেনে নিতে পারে না।" ইসরাঈল দখলদার বাহিনী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের পক্ষে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের চেয়ে তারাই বেশ ভাল যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। ইসরায়েলের এমন দাবিকে আরো জোরালো করছে এবিসির মত পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম, যেখানে বিশ্ববাসীকে তারা দেখাতে চাইছেন যে ফিলিস্তিনীদের আগ্রাসনের বিপক্ষে ইসরায়েল আত্মরক্ষা করছে। যদিও বাস্তব প্রমাণ ও চিত্র ঠিক তার উল্টো এবং মজার বিষয় হল এরা সেই ফিলিস্তিনীদের কথাই বলছে যারা নিজেরাই অবরুদ্ধ।

অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদে, আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান না হলেও ইসারায়েলের জন্য এখানে কিছু কৌশলগত লক্ষ্য বিদ্যমানঃ নিজেদের কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করা; শত্রুর সামরিক হম্বিদম্বিকে দুর্বল করা; বিদ্যমান কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠা এবং রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সহায়ক একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানো।

রাজনীতি কিংবা কুটনীতিকে চলমান রাখতে এখন যুদ্ধকে আরেকটি মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং কুটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে যা অর্জিত হয়নি সামরিক শক্তির বলে তা পাবার প্রত্যাশা প্রবল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এখন কূটনৈতিক অচলাবস্থার কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে পূরণ করার চেষ্টা করে যা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে "শান্তি প্রক্রিয়া" হিসেবে পরিচিত।

চলমান সংঘাতে লিপ্ত সব পক্ষকেই ২০০৮ এবং ২০১২ সালের যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখা উচিত যে, এবারের সংঘাত আরো বেশি অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আর তার ইসরায়েলি কোয়ালিশন সরকার মনে করে শক্ত সামরিক অভিযান তাদের জন্য আরো আনুকুল্য বয়ে আনবে। তবে সেটা যে সাময়িক তা কিন্তু বলাই বাহুল্য।

এই কান্ডজ্ঞানহীন সংঘাত থেকে ইসরায়েলি বা ফিলিস্তিনীদের কি কোন প্রাপ্তি আছে?

কয়েকটি কারণে নেতানিয়াহু সরকার ভাবছে যে তাদের প্রাপ্তিই সবচেয়ে বেশি:

প্রথমত, ইসরায়েল আশাবাদী যে এই হামলা হামাস এবং ফাতাহর মধ্যকার জাতীয় ঐক্যের সরকারকে প্রান্তিক অবস্থায় ফেলবে যে ঐক্যমতের সরকার নেতানিয়াহুর বিরক্তি সত্ত্বেও পশ্চিমা মিত্রদের সবুজ সংকেত প্রাপ্ত।

দ্বিতীয়ত, এই হামলা নেতানিয়াহুকে তার কোয়ালিশন সরকারে কর্তৃত্ব ধরে রাখতে সহায়তা করবে। কারণ তার কট্টর সহযোগীদের দাবিই ছিল যে, অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আগ্রাসী আক্রমণ চালানো যাতে অবৈধ বসতি স্থাপন সম্প্রসারণ করা যায় এবং মাহমুদ আব্বাসকে জাতিসংঘের স্বীকৃতি ও হামাসের সাথে জাতীয় ঐক্যমতের ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য শাস্তি প্রদান করা যায়।

তৃতীয়ত, এই হামলা ইসরায়েলেকে তার কূটনৈতিক অচলাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান পৃষ্টপোষক হয়েও ইসরায়লকে পিএলও এর মতই সমানভাবে দোষারোপ করেছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য। এখন এই অভিযানের সময়ে ওবামা প্রশাসন ইসরায়লেরে আত্মরক্ষার অধিকারের উপর জোর দিচ্ছে এবং একটি যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

সবশেষ, নেতানিয়াহু ভাবছেন যে বর্তমান আঞ্চলিক অবস্থা বিশেষত মিশর পরিস্থিতি তাকে আক্রমণ চালানোর এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল-সিসির দমননীতি একি আদর্শিকভাবসম্পন্ন ইসলামী আন্দোলন হামাসের উপরও দমনের জন্য ইসরায়লের কৌশলগত সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মিশরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিসিকে কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একজন কৌশলগত মিত্র মনে করেন। আর এটাও নেতানিয়াহুর অজানা নয় যে, এই অঞ্চলের যে কোন জায়গায় ব্রাদারহুডের প্রভাব খর্ব হয়ে পড়াটা সিসির জন্য মহা সুখবর, আর তা যদি হয় ঘরের সামনের গাজা উপত্যকায় তাতে সিসির তো নারাজ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই!

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক এবং এই সংঘাতের তারাই হল প্রধান বলি, এমনকি যারা গাজায় আছে তাদের জন্য এর চেয়ে খারাপ পরিণতি আর নেই।

যাহোক, যদি হামাস ও অন্যান্য দলসমূহ টিকে থাকতে পারে এবং ইসরায়েল যদি তার সামরিক উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় তাহলে ফিলিস্তিনিদের মাঝে তো বটেই এমনকি গোটা অঞ্চল জুড়েই এই আন্দোলনের অবস্থা বর্তমান দুরবস্থা কাটিয়ে আরো উন্নতি লাভ করবে।

হামাসের নিজস্ব উৎপাদিত সল্প ও দূরপাল্লার রকেট যা কিনা ইসরায়েলের প্রধান শহরগুলোতে আঘাত হানতে সক্ষম তা ইতিমধ্যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে হতভম্ব করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত অচলাবস্থায় মিশরের মধ্যস্থতায় আর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে একটি যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা প্রবল। যদি তাই হয় তবে সেটা হামাসের জন্য খুবই সহায়ক হবে। একই সাথে আগের বারের যুদ্ধবিরতির শর্তগুলোর যেসব এখনো ইসরায়েল পূরণ করেনি তা পূরণে এবং বন্দি বিনিময় চুক্তির বাস্তবায়নেও নতুন করে চাপের মুখে পড়তে হবে ইসরায়েলকে। তা না হলেও অন্তত নতুন প্রতিশ্রুতি দিতে অনেকটাই বাধ্য হবে ইসরায়েল।

তৃতীয়ত, হামাস এটাও বিবেচনায় আনতে পারে যে, মিশরের সরাসরি মধ্যস্থতায় যেমনঃ গাজার অবরোধ তুলে নেওয়া এবং মিশর সংলগ্ন গাজার সীমান্ত খুলে দেওয়ার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত হলে সিসির সরকারের সাথে তাদের দূরত্বও কমে আসবে।

সর্বশেষ আব্বাসকে নিয়ে বলতে হয় যে, তীব্রতর হয়ে ওঠা এই সংঘাত যদি আরেকটি জাগরণের সৃষ্টি করে তাহলে তার ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। তিনি তৃতীয় কোন ইন্তিফাদার প্রবল বিরোধী এবং তার শাসন ও দেশের স্বার্থেই ইসরায়েলের সাথে বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করেন। কিন্তু গাজায় হামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই মুখোমুখি অবস্থার যদি দ্রত অবসান হয়, তাহলে আব্বাসের সুসময়। কেননা সে অবস্থায় তাকে সামনে আনা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আর কোন গ্রহণযোগ্য বিকল্প নেই।

তাহলে ফিলিস্তীন-ইসরায়েল এর ভবিষ্যৎ কি?

এই উত্তেজনা ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনী নেতাদের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে সাহায্য

করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে চূড়ান্তভাবে সহায়ক হবে না।

এ কারণে ইসরায়েলের ৪০,০০০ রিজার্ভ সৈন্য মোতায়েনের অনুমোদন তার জন্য সুখকর নয়। এটা ইসরায়েলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বেশ ব্যয়বহুল যা সংকটকে আরো বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো এই বিরাট উদ্বেগ রাজনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র আর মিশরকে কতটুকু স্পর্শ করতে পারে যাতে করে কূটনৈতিকভাবে কোন সমাধানে আসতে তারা ইসরায়েলকে রাজি করাতে পারে।

ইসরায়েলের এই সামরিক আগ্রাসনের অভিসন্ধি এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন চিরতরে গাজা পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কারণ ইসরায়েল মনে করে গাজা এই অঞ্চলের এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন, জনবহুল আর দারিদ্রে জর্জরিত উদ্বাস্তু শিবির। তাই গাজায় চূড়ান্ত অভিযান চালানো এবং একে পূর্ণভাবে দখল করা খুবই ব্যয়বহুল এবং তা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে।

যাহোক লেবানন ও গাজার ইতিহাসকে বিচার করলে দেখা যায় ইসরায়েলী নেতৃত্ব এ ধরণের বোকামী করতে অধিকতর সক্ষম। ইসরাইল কৌশলগত হামলা চালানোর চেষ্টা করতে পারে যা অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে।

এই আগ্রাসন কেবল উত্তেজনা আর সংঘাতকেই উস্কে দিচ্ছে যা কিনা গভীর শত্রুতার বীজ বপন করছে এবং একি সাথে শান্তি প্রক্রিয়াকে আরো দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এর অবসান ঘটতে পারে শুধু একভাবেই আর তা হল ইসরায়েলের অন্যায় অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া, ফিলিস্তিনীদের মুক্তি দেওয়া এবং দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো।

যতদিন পর্যন্ত এই দখলদারিত্ব অব্যাহত থাকবে ততদিন তা উভয়পক্ষের মধ্যে কেবল সংঘাত, অস্থিরতা আর ঘৃণার জন্ম দিতে থাকবে। এই পুরো অঞ্চলটাই এখন টালমাটাল। ফলে ব্যতিক্রম না ঘটলে আঞ্চলিক চাপে এই সমস্যার কোন সমাধান হবেনা বলেই ধারনা করা যায়।

দুঃখজনক ব্যাপার হল ইসরায়েলের পশ্চিমা মোড়লবৃন্দ উত্তেজনা প্রশমনে ইসরায়েলের উপর কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ তো দূরে থাকুক এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ারও কোন প্রয়োজন অনুভব করছে না। এমনকি এই সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের ভাষণেও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সুর স্পষ্ট।

হ্যাঁ, অন্য সব রাষ্ট্রের মত ইসরায়েলেরও তার নিজেকে আর তার নাগরিকদের রক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু তাই বলে সে এই অধিকারের আড়ালে নিজের দখলদারিত্ব আর নাগরিকদের অবৈধ বসতি স্থাপনে কোনভাবেই অন্যের উপর আগ্রাসন চালাতে পারেনা।

উৎসঃ aljazeera

মারওয়ান বিশারা

মারওয়ান বিশারা আল জাজিরার সিনিয়র রাজনৈতিক বিশ্লেষক।